# অষ্টম অধ্যায়

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

মহাভারতের আখ্যানকে আশ্রয় করে নতুন সাহিত্য নির্মাণের যে প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শুরু হয়েছিল তা থেকে রবীন্দ্রনাথও বিচ্যুত হননি। তাঁর সৃষ্টিতে মহাভারতের উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯), বিদায়-অভিশাপ (১৩০০), গান্ধারীর আবেদন (১৩০৪), নরকবাস (১৩০৪), কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (১৩০৬) -এই পাঁচটি কাব্যনাট্য ছাড়াও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রায় সকল ধারাতেই অনিবার্যভাবে এসেছে মহাভারতের প্রসঙ্গ। কবিতা, ভ্রমণসাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্যে মহাভারতের প্রসঙ্গ বারেবারে এসেছে। কবিব শৈশব চেতনায় মহাকাব্যের যে প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী জীবনে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'অভিলাষ', 'হোক ভারতের জয়', 'হিন্দুমেলার উপহার' প্রভৃতি কবিতায় মহাভারতের প্রতি কবির আবেগ ব্যক্ত হয়েছে -

''দুর্যোধন-চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডুপুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।''[১] (অভিলাষ)

'কৃষ্ণচরিত্র', 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' বিবিধ প্রসঙ্গের অন্তর্গত 'মনোগণিত', 'অধিকার', 'অনধিকার' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে মহাভারত সমন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মহাভারতকে মহান ট্র্যাজেডি বলে উল্লেখ করেছেন- কোনো চরিত্রের মৃত্যু দিয়ে

মহাভারতের ট্র্যাজেডি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়নি। তাঁর ভাষায়, ''কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পান্ডবদিগের জয় হইল তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্রাজেডি আরম্ভ হইল। তাহারা দেখিয়াছিল জয়ের মধ্যেই পরাজয়।''[২]

'সোনারতরী' কাব্যের 'পুরষ্কার' কবিতার মহাকাব্যের বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে -

''কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার,
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি-
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী,
চিহ্ন নাহিকো আর।

. . .  . . .  . . .

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ
সফল আশার বিষাদ মহান
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে।''[৩]

বৈরাগ্যপন্থার আদর্শই মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথের চরম প্রাপ্তি। জীবনের উপান্তে এসেও মহাভারতের সেই শিক্ষাকেই কবি পরম সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন-

> ''মহাভারতের আখ্যানভাগেরও অধিকাংশ যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা অধিকৃত- কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিনাম নয়। নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্তসমুদ্র থেকে উদ্ধার করে পাণ্ডবদের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয় নি। এতে দেখা যায়, জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ করে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন-এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ।''[৪]

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য দুটিকে কেবল আখ্যানকাব্য মনে করেন নি, তিনি এগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের শেকড় অনুসন্ধান করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন -

> ''রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশষকে অবলম্বন করিয়া থাকে- রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।''[৫]

মহাভারতের সূচনাতে প্রাচীন কবিগণ তাকে ইতিহাস বলেই উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধি করে 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে লিখেছেন -

> ''এই-সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুজিলে পাওয়া যাইবে।''[৬]

রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে কবির আকষর্ণ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। মহাকাব্যের নানা চরিত্র তাঁর কাব্যনাট্য গুলিতে অভিনব মাত্রা পেয়েছে। চিত্রাঙ্গদায় নারীত্ব সম্বন্ধে, বিদায় অভিশাপে প্রণয়মহিমা সম্বন্ধে এবং গান্ধারীর আবেদন ও নরকবাসে মানবধর্ম সমন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। চিত্রাঙ্গদায় কাব্যের অতিরিক্ত কবির যে সূক্ষ্ম আদর্শবোধ প্রকাশিত হয়েছে তা বোধ হয় এই যে, পুরুষের যৌন আকর্ষণে নারীর রূপ অনেকাংশে কাজ করলেও নারীকে ভোগের বস্তুরূপে দেখলে অকৃতার্থ হয় পুরুষ নিজেই। বিদায়-অভিশাপ খণ্ডকাব্যে করুণরসের মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে কর্তব্য থেকে প্রেমের মর্যাদা গুরুতর। কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে মাতৃধর্মের নৃশংস অবহেলা দেখানো হয়েছে, গান্ধারীর আবেদনে রাজনীতি ও রাজধর্মের নৃশংস কর্তব্যকে পাপ ও অধর্ম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আর নরকবাসে শাস্ত্র ও প্রথার আনুগত্যের নিষ্ঠুর দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯) :

চিত্রাঙ্গদায় রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ তত্ত্ব ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। দৈহিক সৌন্দর্যের অন্তরালে প্রকৃত সত্তার স্বরূপ উন্মোচনে নর-নারীর অভিব্যক্তিকে তিনি প্রক্ষেপণ করেছেন মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনির মধ্যে। মূল মহাভারতের সঙ্গে এই কাব্যনাট্যের সংযোগ খুব ক্ষীণ। বরং পূর্ববর্তী নাটক 'রাজা ও রানী'র সঙ্গে 'চিত্রঙ্গদার' আদর্শগত সাদৃশ্য রয়েছে। সুমিত্রা ও চিত্রঙ্গদা উভয়ের মধ্য দিয়ে কবি নারীর আত্মবোধের পরিচয় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তবে 'চিত্রাঙ্গদা'র তত্ত্বগত পরিকল্পনা সুমিত্রা থেকে বেশি স্পষ্ট। সুমিত্রা সুসম্পূর্ণ নাট্যিক চরিত্র, চিত্রাঙ্গদা একটি বিশেষ তত্ত্বের বাহন-

> ''সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছেন তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়।''[৭]

উপরোক্ত ভাবনার সঙ্গে মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা অংশের নাট্যরূপান্তর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন -

> ''এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল, সেইসঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।''[৮]

রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব ভাবনা মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনির সঙ্গে সূক্ষ্ম সাদৃশ্যে কায়া রূপ লাভ করেছে। নাটকে অর্জুন প্রথমে রূপহীনা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে প্রলুব্ধ হন নি। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা কুরূপা ছিলেন না, বরং অতি সুন্দর ছিলেন। আদিপর্বে অর্জুন তীর্থ পর্যটন করতে করতে মণিপুর রাজ্যে এসে পৌঁছুলে চিত্রাঙ্গদার রূপে বিমুগদ্ধ হয়ে তাঁর পিতার নিকট চিত্রাঙ্গদাকে প্রর্থনা করেন-

''দেবের বাঞ্ছিত কন্যা পূর্ণা রূপে গুণে।
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল অর্জুনে।।
কন্যা দেখি মোহিত হইয়া ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে রাজার আলয়।।''[৯]

মনিপুররাজ চিত্রভানুর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদা কে পুত্রের মতো স্বাধীন ভাবে লালন করেন। অর্জুনের প্রস্তাবে তিনি শর্ত সাপেক্ষে কন্যা দান করতে সম্মত হন। চিত্রঙ্গদার পুত্রই মনিপুরের রাজা হবেন -

''পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন।
মম রাজ্যে রাজা হৈতে নাহি আর জন।।
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠপুত্র হৈবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে।।''[১০]

চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করে অর্জুন তিন বছর মণিপুর রাজ্যে অবস্থিতির পর পুনরায় তীর্থদর্শনে গেলেন এবং ফিরে এসে পুত্র বভ্রুবাহনকে দেখলেন। তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বললেন, পুত্রকে পালন কোরো, রাজসূয় যজ্ঞের সময় পিতার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যেয়ো। নাটকে বভ্রুবাহনের জন্ম পর্যন্ত কাহিনিকে প্রলম্বিত করেন নি রবীন্দ্রনাথ। কেননা মাতৃত্বের গর্ব থেকে নারীত্বের গর্বেই চিত্রাঙ্গদা অধিকতর মুখরা।

মহাভারতের পরিচিত কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন তাৎপর্য দান করেছেন। দুটি রূপক চরিত্র মদন ও বসন্ত নাট্যকাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মদন চিত্রাঙ্গদারই অন্তরের প্রসারিত রূপ। বসন্ত প্রকৃতির লীলা-চঞ্চল সৌন্দর্যের প্রতিনিধি। নাটকে অর্জুনকে আকৃষ্ট করার জন্য চিত্রাঙ্গদা যে সৌন্দর্য মদন ও বসন্তের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন শেষপর্যন্ত সেই রূপের প্রতিই বিরূপ হয়ে আত্মন্বেষণ করেছেন। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার বাহ্যিক সৌন্দর্যের মোহে ধরা দিলে চিত্রাঙ্গদা পীড়া বোধ করেছেন।

''মুহূর্তেকে সত্যভঙ্গ
করি অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা।''[১১]

বাহ্যিক সৌন্দর্যকে চিত্রাঙ্গদা সহ্য করতে পারছেন না। তাই ভিক্ষালব্ধ সৌন্দর্যের মোড়ক উন্মোচন করতে তিনি মরিয়া। অর্জুনের কাছে তাঁর প্রকৃত সত্তা পৌঁছুতে পারছে না। এ এক ভীষণ আত্মপ্রবঞ্চনা।

''অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
বাসরশয্যায়।''[১২]

দেহের সৌন্দর্য অন্তরের কোন পরিচয় প্রকাশ করতে পারে না। অন্তরের কামনার সার্থকতার পথে দৈহিক সৌন্দর্য সহায়ক মাত্র। অন্তরই চিরন্তন ও সত্য, বাইরের রূপ ক্ষণিক বলেই মিথ্যা। মিথ্যা সৌন্দর্যের চেয়ে সত্য রূপহীনতা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

''সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি-আমি বর।''[১৩]

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশি লিখেছেন-

> ''বৈষ্ণব কবিদের রাধিকা হইলে অন্য উত্তর দিত; সে বলিত, আমি মরি আর বাঁচি তাহা ভাবিবার নয়-আমার প্রিয় তৃপ্ত হইলেই হইল; তাহাতেই আমার তৃপ্তি। প্রেমের আসল লক্ষণ আত্মবিস্মৃতি চিত্রাঙ্গদার প্রেমে নাই, সে 'আমি'টাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। 'আমি'-বিস্মরণের বৈরাগ্য তাহার মধ্যে নাই। . . . ধার-করা রূপে তাহার 'আমিত্ব' তৃপ্ত হইতেছে না; অর্জুনকে তৃপ্তি দিতে গিয়া তো আর সে নিজের আমিত্বকে খর্ব করিতে পারে না! ধার-করা রূপে যে তাহার আমিত্ব খর্ব হয়- তাহার প্রেমের লক্ষ্য প্রেমিক নয়- সে নিজে, তাহার বিশ্বগ্রাসী আমি।''[১৪]

মহাভারতের অর্জুনের সঙ্গে নাট্যচরিত্রের বিশেষ সম্পর্ক নেই। পুরুষের মনে নারী সম্পর্কিত যে ধারণা চিরন্তন তা অর্জুনের মধ্য দিয়ে ব্যাক্ত করা হয়েছে। তাঁর পুরুষ মনে ভোগের তৃষ্ণা কৃত্রিম আদর্শের দ্বারা সাময়িক ভাবে রুদ্ধ থাকলেও অনুকূল অবসরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আবার মণিপুর রাজ্যের উপর পার্বত্য জাতির অকস্মাৎ আক্রমণে অর্জুনের বীরচিত্তের জাগরণ ঘটে। অর্জুন প্রকৃত পক্ষেই বীর। তিনি মোহের চেয়ে সত্যকে বড় মনে করেন বলেই চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত স্বরূপ জানবার পর উচ্চারণ করেন- 'প্রিয়ে আজ ধন্য আমি'।

মহাভারতের চিত্রঙ্গদা আখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ মাত্র করেছেন। এই কাব্যনাটকের প্লট, কাহিনি, চরিত্র পরিণাম সবই তাঁর উদ্ভাবিত। অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনিতে মদন ও বসন্ত রূপক চরিত্র দুটি নাট্যকারের সৌন্দর্য চেতনার বাহক। নাট্যগুণ আপেক্ষা কাব্যগুণ অধিকতর হলেও প্রধান চরিত্র দুটির অন্তরের যে সূক্ষ্ম ভাব-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় তার নাট্যিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষা রবীন্দ্রপ্রতিভার অনন্য পরিচয় বহন করে।

বিদায়-অভিশাপ (১৩০০) :

মহাভারতের আদিপর্বে কচ-দেবযানীর কাহিনি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'বিদায়-অভিশাপ' কাব্যনাট্যটি রচনা করেন। শুক্রাচার্যের নিকট সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভের পর বৃহস্পতি পুত্র কচ গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গাভিমুখে প্রত্যাবর্তন কালে দেবযানী তাকে স্পষ্ট ভাবেই বললেন, ''হে তপোধন! তুমি নিয়মস্থ বা ব্রতনিষ্ঠ হইলে আমি তোমার সবিশেষ শুশ্রূষা করিতাম; এক্ষণে তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা, অতএব মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আমার পাণিগ্রহণ কর।''[১৫] দেবযানীর কথা শুনে সঞ্জীবনী মন্ত্র লোভী কচ বিস্মত হয়েছেন। কাশীরাম বর্ণনা করেছেন-

''শুনিয়া বিস্ময়ে কহে জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিহ আর।।
গুরুর তনয়া তুমি, আমার ভগিনী।
এমত কুকথা কেন বল দেবযানী।।''[১৬]

বৃহস্পতি পুত্র কচকে অত্যন্ত প্রফেশনাল ভাবেই কৃষ্ণদৈপায়ন কাশীরামেরা চিত্রিত করেছেন। মহাকাব্যের কবিদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর এক চিরন্তন সত্য রয়েছে। আবার পরবর্তী কালের অন্য এক মহাকবি একই কাহিনিকে যখন প্রেম রসে আর্দ্র করলেন তখন কচের হৃদয়েও প্রেমের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। মহাকাব্যের কচ দেবযানীর কাছে বিদায় নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। রবীন্দ্রনাথের কচ বললেন, 'দেহ আজ্ঞা দেবযানি, দেবলোকে দাস/ করিবে প্রয়াণ।'

'বিদায়-অভিশাপে' কচের বিদায় প্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন-

''বাস্তব মহাভারতে যা আছে, সেটাকে আকরিক স্তর থেকে নান্দনিক স্তরে নিয়ে যাবার জন্য কচকেই প্রথমে দেবযানীর কাছে নিয়ে আসার এই যে মুখীবন্ধ, এটাই কচ-দেবযানী সংবাদের গহন পারস্পরিকতা তথা নান্দনিক বিদায়ের সুর বেঁধে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথে।''[১৭]

দেবযানী মহাকাব্যের ঢঙে পাণিগ্রহণ করার কথা প্রথমেই বলতে পারলেন না। তিনি কচ কে ভেবে দেখতে বলেছেন হৃদয়ের গহীনে কোনো সুপ্ত কামনা আছে কি না।

''কিছু নাই? তবু আরবার দেখো চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান-অন্তরের প্রান্তে যদি
কোনো বাঞ্ছা থাকে . . . ''[১৮]

কচের নির্লিপ্ততায় দেবযানী তির্যক কটাক্ষ বাক্যে স্বর্গের প্রতিতুলনায় মর্ত্যের তুচ্ছতার ভেতর প্রকৃতির মায়াবী বন্ধনের স্মৃতিকে জাগ্রত করে ক্রমে প্রেমের মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। দেবযানীর স্বরূপ সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন-

> ''মূলের দেবযানী হইতে বিদায়-অভিশাপের দেবযানী অধিকতর ছলাকলাময়ী, মনের বেদনাকে সূক্ষ্মসঙ্কেতময় ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তিও তাহার অধিক, মনোভাবের প্রতিবিম্বরূপে তপোবনপ্রকৃতিকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার ক্ষমতা তাহার নূতন-এ সমস্তই আধুনিক কালোচিত লক্ষণ।''[১৯]

বরীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে বিদায় অভিশাপ সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে তাত্ত্বিক আলোচনা করে অবশেষে সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন-

> ''কচ-দেবযানী সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধ্যন্য দেন, তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।''[২০]

স্বর্গের ঈপ্সিত সুরঙ্গনাদের আড়ম্বরপূর্ণ অভিবাদনের ব্যঙ্গে দেবযানী বাঁধন শিথিল করে কচের প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইলেন, 'যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে/ উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া।' মহাকাব্যের স্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে অভিমানী স্বর সংযোজন করলেন রবীন্দ্রনাথ যার ভেতর করুণ বেদনার সুর বেজে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের দেবযানীর অন্তত কিছুটা সময় কচকে আটকে

রেখেছেন, তিনি সমস্ত অভিযোগ অনুযোগ নিজের হৃদয়াবেগকে অবরুদ্ধ রাখতে পালেন না। স্বর্গের বৃহত্তর স্বার্থে আত্মসুখকে কচ যেভাবে দমন করেছেন তাতে তার হৃদয়ও প্রবলভাবে বিকম্পিত হয়েছে। মহাকাব্যের যান্ত্রিক হৃদয়ের কচের প্রেমিক সত্তা ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে দেবযানীর স্মৃতির সরণি বেয়ে। মহাভারতে যে সৌহার্দ এবং অনুরাগের কথা দেবযানী বলেছেন রবীন্দ্রনাথ সেটাকে এক কাব্যিক নান্দনিকতায় মোহময় করে তুলেছেন। অতিথিবৎসল বটবৃক্ষ বা হোমধনু মহাভারতে কাহিনির বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে, অবশ্য স্রোতস্বিনী বেনুমতী রাবীন্দ্রিক সংযোজন। মধুসূদনের পত্রকব্যের রোমান্টিক নায়িকার অতীত প্রসঙ্গ উন্মোচনের সঙ্গে ক্ষীন সাদৃশ্য লক্ষকরা যায়। তাঁর তারা প্রেম বুভুক্ষিত অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনাকে অনেকটা অনাবৃত ভাবেই প্রকাশ করেছে।

''যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে-ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে।''[২১]

কুমারী দেবযানীর বর্ণনা স্নিগ্ধ-

''যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রহ্মণ, তরুণ অরুণপ্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা,
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া-''[২২]

মহাভারতের কচ নিষ্ঠুর। রবীন্দ্রনাথে দেবযানীর প্রতি কচের প্রত্যাভিশাপ নেই। দেবযানীর অভিশাপ স্বাভাবিক হলেও কচ অভিশাপের বদলে বরদান করেছেন। কচের হৃদয়ের যন্ত্রনা, প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে অনিচ্ছায় কর্তব্যের কাছে আত্মসমর্পনের বেদনা প্রস্তর যুগের আখ্যানকে হৃদয়ের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

গান্ধারীর আবেদন (১৩০৪) :

মহাভারতের সভা পর্বে কপট দ্যূতে পাণ্ডবগণ পরাজিত হলে গান্ধারী দুর্যোধনকে ত্যাগের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে তিরষ্কার করেন। প্রথমবার পাশাখেলার পর গান্ধারীর প্রতিবাদ নাটকে দ্বিতীয়বার খেলার পরে উৎথাপন করা হলেও মূল বক্তব্যে ধর্মপায়ন নারীর আদর্শ একই রয়েছে। মূলে যা সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তা সূক্ষ্ম ও জটিল। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে তাঁর পুত্রেরা আশীর্বাদ প্রর্থনা করতে এলে তিনি কখনোই বলেননি তোমাদের জয় হোক, সর্বদাই বলেছেন ধর্মের জয় হোক। ধর্মপরায়ন বিশ্বমাতৃত্বের হৃদয় কখনোই অন্যায়কারী পুত্রদের সমর্থন করেনি। মহাভারতের স্ত্রীপর্বে পুত্রশোকে কাতর গান্ধারীকে সান্তনা দেবার জন্য মহর্ষি ব্যাস বলেছিলেন -

''যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন।
জিনিবেক কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কোন জন।।
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার, বলহ আমারে।।
তবে তুমি সত্য কথা কহিলে তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন।।''[২৩]

নাটকে গান্ধারী চরিত্র প্রধান হলেও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পাঠকের সমবেদনা সবচেয়ে বেশি। কেনেনা ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে ট্র্যাজিডির দ্বন্দ্বজাত বেদনা আছে কিন্তু গান্ধারীর পুত্রত্যাগের দুঃখ থাকলেও ধর্মত্যাগের দুঃখ নেই। ধর্মনিষ্ঠ গান্ধারী তাঁর আদর্শ থেকে বিচলিত নন, অপরদিকে পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নীতিবোধের দ্বারা বিচলিত আবার পুত্রদের অন্যায় স্বার্থে প্রলুব্ধ। প্রথম দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্র নানা যুক্তিতে দুর্যোধনকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু দুর্যোধনের অভিমানে স্নেহান্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত অনুমতি প্রদান করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র বুদ্ধি বিবেচনার দিক থেকে ধর্ম অথচ অন্তঃকরণের দিক থেকে পুত্রকে অবলম্বন করতে চান। দুর্যোধন যখন পরপর জিতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি আত্মগোপন করতে না পেরে বারবার জানতে চাইছিলেন এবারে কি জয় করল।

''ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হৈল সজল নয়ন।।
বিমর্ষ বিদুর বসিলেন অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে।।
হৃষ্ট হৈয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল কে জিনিল বলে জিজ্ঞাসিল
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্রে আর।।''[২৪]

ধৃতরাষ্ট্রের দ্বৈত সত্তা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের মূল ভাবটি পরিস্ফুট করে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র ও উক্তি-প্রত্যুক্তি নির্মান করেছেন। দুর্যেধনের সর্বনাশী রাজনৈতিক দম্ভোক্তি তার ব্যক্তিত্বের চৌম্বক শক্তি দর্শকের বিচার বুদ্ধিকে আবিষ্ট করে।

ধৃতরাষ্ট্র : ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ।
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি?
দুর্যোধন : ভুলিতে পারি নে সে যে-
এক পিতামহ, তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। যদি হত দূরবর্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ;[২৫]

রবীন্দ্রনাথ আসাধারণ শিল্প সৌকর্যে দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধ হৃদয় উন্মোচন করেছেন-

''ধর্মবিধি বিধাতার
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য; অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা-
. . .  . . .  . . .

প্রিয়ে, সংহর , সংহর
তব বাণী। ছিঁড়িতে পারি নে মোহডোর,
ধর্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা। পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি''[২৬]

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের মাত্রা' গ্রন্থে 'সাহিত্যের চিত্রবিভাগ' প্রবন্ধে মহাভারতের অন্যন্য চরিত্রের তুলনায় ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছেন -

''ওদিকে দেখো ভীষ্মকে, তাঁর গুণগানের অন্ত নেই, অথচ কৌরবসভার চিত্রশালায় তাঁর ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বসে আছেন একজন নিষ্কর্মা ধর্ম-উপদেশ-প্রতীক মাত্র হয়ে। ওদিকে দেখো কর্ণকে, বীরের মতন উদার, অথচ অতি সাধারণ মানুষের মতন বারবার ক্ষুদ্রাশয়তায় আত্মবিস্মৃত। এদিকে দেখো বিদুরকে, সে নিখুঁত ধার্মিক; এত নিখুঁত যে, সে কেবলই কথা কয় কিন্তু কেউ তার কথা মানতেই চায় না। অপরপক্ষে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতিমুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে এমন অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যে যদিচ জেনেছেন অধর্মের এই পরিণাম তাঁর স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুণ শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত চিত্তকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারেন নি। এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি-মনুসংহিতার শ্লোকের উপরে উপদেশের দাগা বুলানো নয়। এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিক্‌ভ্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের জন্য স্থির রইলেন।''[২৭]

মূল আখ্যানে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কুলক্ষয়ের আশঙ্কা, দুর্যোধনের পাপাচরণ ও দুর্বুদ্ধিতার কথা বলেছেন।

''বৃদ্ধ হৈয়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি।।
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যাজি নিজ বংশ রাখহ রাজন।।''[২৮]

পুত্রের চেয়ে ধর্ম রক্ষাই গান্ধারীর কাছে শ্রেয়। এ বিষয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীর মধ্যে একজন ধর্মনিষ্ঠ ও প্রতিবাদী নারীকে প্রকাশ করেছেন। গান্ধারীর আবেদন প্রথমত রাজার কাছে, কেননা রাজা বিধাতার বাম হস্ত। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর আবেদন ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত তিনি বিধাতার কাছে আবেদন করেছেন। নাট্যসমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় রবীন্দ্রকাব্যনাট্যের গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের সমালোচনা করে লিখেছেন -

> ''গান্ধারীর চরিত্র আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহার সঙ্গে রক্তমাংসের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না; সেইজন্য গান্ধারীর শত যুক্তির সম্মুখে ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র যুক্তি 'আমি পিতা' যত বেশি সত্য বলিয়া মনে হয়, গান্ধারীর উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহাভিব্যক্তিও তাহার সম্মুখে নিতান্ত প্রাণহীন অভিনয়ের মত বলিয়া বোধ হয়।''[২৯]

গান্ধারীর সঙ্গে ভানুমতি ও দ্রৌপদীর কথোপকথন এবং বনগমনে উদ্যত যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সান্ত্বনাবাক্য মূল আখ্যানে নেই। মূলে পাণ্ডবদের প্রতি বিদুরের আশ্বাস ও আশীবাদ রয়েছে, আর দ্রৌপদী বিদায় নিয়েছেন কুন্তীর নিকট। স্বল্প পরিসরে ভানুমতী দুর্যোধনের যোগ্য সহধর্মিনী রূপে নাটকে স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। গান্ধারী যেভাবে ন্যায়ধর্ম ও কল্যাণাদর্শকে অপত্যস্নেহের উর্ধ্বে ধ্রুব সত্য বলে জেনেছেন -তাতে তাঁরা মহাভারতের ক্লাসিক যুগ থেকে আধুনিক জীবনবোধের সমতলে এসে দাঁড়িয়েছেন।

## নরকবাস (১৩০৪) :

মহাভারতের বনপর্বে সোমক রাজা বৃদ্ধকালে সন্তান লাভ করলে একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহাতিশয্যে রাজকর্তব্যে অবহেলা ও কুলপুরোহিতের অবমাননা করায় পুরোহিত রাজাকে ভৎসনা করেন। একক সন্তানের প্রতি অতিবাৎসল্য থেকে অব্যহতি পেতে ক্ষত্রিয়াভিমানী রাজা সোমক পুরোহিতের নির্দেশে আত্মজকে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে শতপুত্র লাভ করেন। কিন্তু শিশু হত্যার পাপে পুরোহিতের নরকবাস হয়। সোমক স্বর্গারোহন কালে পুরোহিতকে নরকে দেখে

পীড়িত হয়ে যমরাজের কাছে নরকবাস প্রর্থনা করেন যতদিন না উভয়েই মুক্তিলাভ করেন। মহাভারতের এই কাহিনি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'নরকবাস' কাব্যনাট্যটি রচনা করেন।

'গান্ধারীর আবেদনে' সন্তানকে রক্ষার জন্য ধর্মত্যাগ আর এখানে ধর্মরক্ষার জন্য সন্তানকে হোমানলে সমর্পন করা হয়েছে। সোমক যাকে ধর্ম বলে মনে করেছিলেন তা প্রকৃত ধর্ম নয়, ধর্মের ছদ্মবেশী আত্মাভিমান। হিন্দু ধর্মসংস্কারের হৃদয়হীনতা 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জনে' রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তবে এ দুটি রচনার চেয়ে 'নরকবাসে'র বর্ণনাই নিষ্ঠুরতম। করুণ রসের পরিবর্তে এখানে বীভৎস রসের সৃষ্টি হয়েছে।

'নরকবাসে' সোমক রাজার উপাখ্যানে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি তবে মানবীয় স্নেহধর্ম ও মর্তপ্রীতির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রেতগণের চরিত্র রবীন্দ্রনাথ সংযোজন করেছেন নাট্যকলার উপযোগী করে। মূল আখ্যানে নরকভোগকারী ঋত্বিক রাজাকে তাঁর কাছে থাকার জন্য অনুরোধ করেন নি। রাজা তাঁর নিজের ন্যায়বিচার আশ্রয় করে ঋত্বিকের স্থানে তাঁর নরকভোগ হওয়া উচিত এই প্রার্থনা ধর্মরাজের কাছে করেছেন। ঋত্বিকের মিনতি নাট্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে -

> ''যেয়ো না যেয়ো না তুমি চলে
> মহারাজ! সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
> আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না, যেয়ো না
> একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
> বাড়ায়ো না বেদনার তীব্র দুর্বিসহ,
> সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহো রহো
> মহারাজ, রহো হেথা।''[৩০]

শাস্ত্রদম্ভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অহঙ্কার মানুষকে যে কত নিষ্ঠুর, কত অন্ধ, কত অস্বাভাবিক করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত ঋত্বিক। নাট্যসমালোচক প্রমথনাথ বিশী ঋত্বিককে রঘুপতির সমগোত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

''ঋত্বিক-চরিত্র রঘুপতির ছাঁচে ঢালা। ইহারা শাস্ত্রাভিমান ও আত্মাভিমানকেই ধর্ম বলিয়া জানে; দেবতার স্থানে ইহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ধর্মরে নামে রঘুপতি শিশু হত্যা, রাজ হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ধর্মের নামে ঋত্বিক শিশু হত্যা করিয়াছে। রঘুপতির চেয়েও তাহার দায়িত্ব বেশি, সে পিতাকে ইহার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। হত্যার আঘাত যে কত নিদারুণ জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতি তাহা বুঝিয়াছে, তাহার নরকভোগ পৃথিবীতেই ঘটিয়া গিয়াছে, সে আভিজ্ঞতা ঋত্বিকের জীবনে হয় নাই বলিয়াই মৃত্যুর পরে এখানে আসিতে সে বাধ্য হইয়াছে।''[৩১]

নাটকের ছায়াশরীরী প্রেতেরা সদ্য পৃথিবীচ্যুত সোমককে তাদের মাঝে পেয়ে পুরাতন পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ,স্পর্শ, শব্দ তাদের ব্যকুল করে তুলেছে। স্বদেশের জন্য, স্বস্থানের জন্য, স্বজনের জন্য মানুষের মনে যে চিরন্তন ব্যাকুলতা আছে সেই বেদনা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে প্রেতলোক বাসীদের কণ্ঠে।

''ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের গন্ধ-ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি। ছয়টি ঋতুর
বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভরাশি।''[৩২]

ঋত্বিকের মতো সোমক নরকপ্রাপ্ত হন নি, কিন্তু দীর্ঘকাল সে নরকানল তাঁর হৃদয়কে দগ্ধ করেছে। পুত্রস্নেহের উপর রাজধর্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম জয়ী হলেও তাঁর মনের মধ্যে পুত্রঘতী তীব্র জ্বালা নরকে আশ্রয় করে সান্তনা পেতে চেয়েছে।

''হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ অন্তরতাপ। আমি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম অভিমান?''[৩৩]

## কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (১৩০৬) :

মহাভারতের অন্যতম ট্র্যাজিক চরিত্র কর্ণ। জন্ম মুহূর্ত থেকে ভাগ্য বিড়ম্বিত এই চরিত্রটি কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যনাট্যে স্বল্প পরিসরে পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার বিচিত্র উত্থান-পতনের চিত্র নিপুন ভাবে চিত্রিত করেছেন। বিষয় নির্বাচন ও অনুভূতির সূক্ষ্মতায় 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে অনন্য স্থান দখল করে আছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নয়, অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই এর নাট্যিকগুণ প্রকাশিত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে যে অনুভূতি গুলি প্রধান্য পেয়েছে তা নিতান্তই মানবিক, বাস্তব সম্পর্কহীন আদর্শের দ্বারা পরিচালিত নয়।

মহাভারতে কুন্তী কর্ণের কাছে গিয়েছিলেন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে সন্ধ্যার ভূমিকা দিয়ে কর্ণের আবিষ্ট-বিহ্বল মনের উপযোগী পরিবেশ রচনা করতে চেয়েছেন। মহাভারতকার উদ্যোগপর্বে কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর সাক্ষাৎকার এভাবে বর্ণনা করেছেন,-কুন্তী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন কর্ণ সূর্যের ধ্যানে নিরত রয়েছেন। কর্ণের নিয়ম ছিল যে, পূর্বমুখ হয়ে জপ করার সময় সূর্য যতক্ষণ না তাঁর পৃষ্ঠদেশে কিরণ বিস্তার করত সে পর্যন্ত তিনি জপ থেকে বিরত হতেন না।

কুন্তী নিঃসংকোচে যে ভাবে পুত্রের কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা প্রচীনকালের কবিদের পক্ষে সম্ভব ছিল, কিন্তু আধুনিক কবির রুচিবোধে তা ইঙ্গিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে ব্যক্ত হয়।

কাশীরামের বর্ণনা -

''বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার।।
সূর্য্য-সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
তখনি তোমারে প্রসবিলাম সুমতি।।
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন।।''[৩৪]

মহাভারতের উদ্যোগপর্বের কর্ণ-কুন্তী ও কর্ণ-কৃষ্ণ সংবাদের পরিচিত কাহিনিকে অনুভূতির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ অভিমান প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মহাভারতের কর্ণ কুন্তীর কাছে দৃঢ় অভিযোগ এনেছেন। মহাভারতে কর্ণের মমতা রাধার উপর, তিনি রাধেয়। রবীন্দ্রনাথে কর্ণের হৃদয়ে মাতৃস্নেহব্যকুলতা কল্পলোকে সান্তনা খোঁজে। মূল আখ্যানে কর্ণ তাঁরআত্মপরিচয় পূর্ব থেকে জ্ঞাত। সন্ধিদূত রূপে কৃষ্ণ কৌরব শিবির থেকে প্রত্যাগমনের পথে কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে আনবার জন্য তাঁর জন্মেতিহাস ব্যক্ত করেছেন।

''পথে কর্ণসহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য-কথন।।
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তব উৎপত্তি।
তুমি কর্ণ মহাবীর কুন্তীর সন্ততি।।''[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ পূর্বপরিচয়কে অজ্ঞাত রেখে অভিনব বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। 'তুমি কুন্তী! অর্জুন জননী!' -নাট্যকাব্যের এমন সংক্ষিপ্ত তীব্রতর সংলাপ নাট্যসাহিত্যে দুর্লভ। মহাভারতে কুন্তী চালিত হয়েছেন স্বার্থবোধ দ্বারা পঞ্চপাণ্ডবের পক্ষে আনয়নের রাজনীতির অঙ্ক স্পষ্ট। অপরিনত বয়সে কর্ণের প্রতি যে অন্যায়টুকু করেছিলেন তা স্বীকার করতে নয় বরং জন্ম সূত্রে মায়ের অধিকারকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। কর্ণের প্রতি কুন্তীর বাৎসল্য অপেক্ষা পাণ্ডবদের মঙ্গল চিন্তাই অধিকতর ক্রিয়াশীল।

''ভ্রাতৃগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য যদি নাহি করিবে পালন।।

তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে।।
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার।।''[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ কুন্তীর চরিত্রে সরাসরি স্বার্থপরতা আরোপ করেননি, কিন্তু বিশ্লেষণে বিয়োগব্যথাবিধুরা মা কুন্তীর আড়ালে পাণ্ডবদের পক্ষপাতীত্ব অস্পষ্ট থাকে নি। বাস্তবে কুন্তীর আকুলতা, ক্ষমাপ্রার্থনা এবং অনুশোচনা সত্ত্বেও পাণ্ডবপক্ষেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছিল। মাতৃত্ব যে স্তরে উঠলে নৈতিক ও সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে কুন্তী সে স্তরে উঠতে পারেন নি। কুন্তীর রিক্তহস্তে ফিরে যাওয়ার কারণ স্বরূপ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন-

> ''জননীর দাবী লইয়া কুন্তী আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জননীর শক্তি লইয়া আসেন নাই। কর্ণের উপর সেই শক্তি তাঁহার ছিলও না, সেই জন্যই তাঁহাকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইল''[৩৭]

কর্ণ-কুন্তী সংবাদের দুটি অংশ কৃষ্ণ-কর্ণ সংলাপের অনুরূপ। কর্ণ কে প্রলুব্ধ করতে রাজ্য প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিতে কুন্তী যা বলেছেন তা কৃষ্ণেরই সংলাপ।

''রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো, হে বৎস, উদ্ধার।
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে''[৩৮]

কাশীরামে কৃষ্ণের প্রলুব্ধ বাক্য -

''যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লয়ে বিচিত্র-শরীর।।
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।।''[৩৯]

আবার নাট্যকাব্যের উপসংহারের দিকে কর্ণ কুন্তীকে সান্ত্বনাদান-প্রসঙ্গে যে ভাবী পরিনামের কথা বলেছেন তা বস্তুত কৃষ্ণ-কর্ণ সংলাপের মধ্যেকার কর্ণের ভবিষ্যদ্বাণী-

''কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল।''[৪০]

বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ' কাব্যনাট্যে কর্ণ রাবীন্দ্রিক বাৎসল্য রসে নিমজ্জিত না হয়ে কুন্তীকে লজ্জা দিয়েছে-

''তুমি লজ্জা পেলে না, নতুন করে লজ্জা পেলে না
আজ আমার সামনে এসে দাঁড়াতে, আমাকে পুত্র বলে ডাকতে?''[৪১]

রবীন্দ্রনাথের কর্ণের হৃদয়ে মাতৃস্নেহ তৃষ্ণা বারবার পুত্র ডাক শুনতে চেয়েছে- 'দেবী, কহো আরবার/ আমি পুত্র তব।' জননীর স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন কৌরব সেনাপতি-

''দেবী, তুমি মোর মাতা! তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে-নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ-মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।''[৪২]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলিতে মহাভারতের উপাখ্যান গৌণ হয়ে গেছে। মানব হৃদয়ের নানা বিরুদ্ধ ভাবসংঘাতের রাবীন্দ্রিক বিশ্লেষণই সেগুলির মূল আকর্ষণের বিষয়। মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলিতে আধুনিক জীবনবোধ ও মানবিকতার আবেদনে চিরায়ত পৌরাণিক ঘটনা সমূহ নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায়।

তথ্যসূত্র :


১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘অভিলাষ’, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৭ম খণ্ড, পৃ: ৮, বিশ্বভারতী, ১৪২২

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭০৩, ঐ

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘পুরষ্কার’- সোনার তরী, রবীন্দ্ররচনাবলী, (২য় খণ্ড), পৃ: ৯৪, বিশ্বভারতী, ১৪২২

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘আরোগ্য, কালান্তর, পৃ: ৩৮, বিশ্বভারতী, ১৩৪৭

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘প্রাচীন সাহিত্য’, ‘রামায়ণ’, ৩য় খণ্ড, পৃ:৭০৯, বিশ্বভারতী, ১৪২২

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭০৪, ঐ

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ’, (২ খণ্ড), পৃ: ৩২৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐ

৯. কাশীরাম দাস : ‘মহাভারত’, পৃ: ২১৬, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

১০. কাশীরাম দাস : ‘মহাভারত’, পৃ: ২১৭, ঐ

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ’, (১ম খণ্ড), পৃ: ৩৩৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ’, (১ম খণ্ড), পৃ: ৩৪৩, ঐ

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ’, (১ম খণ্ড), পৃ: ৩৪৪, ঐ

১৪. প্রমথনাথ বিশী : ‘রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ’, পৃ: ৪৮, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪

১৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ‘মহাভারত’ (১ম খণ্ড), পৃ: ১৩১, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১৬. কাশীরাম দাস : ‘মহাভারত’, পৃ: ৬০, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

১৭. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : ‘মহাভারতের অষ্টাদশী’ পৃ: ৬০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ‘রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ’, (১ম খণ্ড), পৃ: ৪১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

১৯. প্রমথনাথ বিশী : ‘রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ’, পৃ: ৩০৮, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'পঞ্চভূত', 'কাব্যের তাৎপর্য' পৃ: ১০৯, বিশ্বভারতী, ১৪১১

২১. মধুসূদন দত্ত : 'বীরাঙ্গনা কাব্য', (সোমের প্রতি তারা) পৃ: ৭, মর্ডাণ বুক এজন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

২২. . রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (১ম খন্ড), পৃ: ৪২০, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

২৩. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৯৪৬, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

২৪. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৩২৯, ঐ

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (১ম খন্ড), পৃ: ৪৯০, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ', (১ম খন্ড), পৃ: ৪৯৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্ররচনাবলী, (১৪ খন্ড), পৃ: ১৯৬, 'সাহিত্যের মাত্রা'- 'সাহিত্যের চিত্রবিভাগ' বিশ্বভারতী, ১৪২২

২৮. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৩৪৬, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খন্ড), পৃ : ১৫২, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯,

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ (১ম খন্ড), পৃ: ৫১৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

৩১. প্রমথনাথ বিশী : 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ', পৃ: ৩০, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ (১ম খন্ড), পৃ: ৫১১, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐ, পৃ: ৫১৫, ঐ

৩৪. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৭০১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

৩৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৬৯০, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

৩৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৭০১, ঐ

৩৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খন্ড), পৃ :১৫৪, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯,

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ (১ম খন্ড), পৃ: ৫৫০, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

৩৯. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৬৯০, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ- ২০১৩

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড), পৃ: ৫৫১, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬

৪১. বুদ্ধদেব বসু : প্রথম পার্থ, পৃ: ৯৩, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৭

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ (১ম খন্ড), পৃ: ৫৪৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬